Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 387 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 387 - 393
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

দলিত জেলে জীবনের আলেখ্য : প্রেক্ষিত হরিশংকর জলদাসের ‘জলপুত্র’

ড. প্রশান্ত দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভ. ডিগ্রি কলেজ ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত
Email ID: daspantu87@gmail.com
0009-0001-1358-5082

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Harishankar Jaladas, Novel, Jalaputra, Kaibartya, Dalit.

Abstract
Harishankar Jaladas is one of the most powerful and popular Bangladeshi novelists and short story writers in present time. He has represented the life of marginalized people in most of his works. Being a representative of ‘Kaibartya’ Community he got the chance to closely observe the life and culture, struggle and crisis of the people of that society. In the novel ‘Jalaputra’, Harishankar has introduced the lifestyle, struggle and crisis of the ‘Kaibartya’ community those who have been neglected by the upper castes for ages. The Dalit people have an important place in this novel. Novelist’s socio-political and cultural ideas, beliefs as well as his profound love for his own community are vividly presented in this novel. The present paper tries to show fishermen’s life in different aspects in the context of the novel ‘Jalaputra’

Discussion

Methodology : বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের উপন্যাস ‘জলপুত্র’ (২০০৮)। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলে জীবনের নানা অনুষঙ্গ, ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য হিসেবে উপন্যাসটি পাঠকের মনোগহণে ব্যতিক্রমী শৈল্পিক অনুভবে ধরা দেয়। উপন্যাসের আখ্যানে প্রতিফলিত হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে উদভ্রান্ত জেলেদের যুগের পর যুগ নিঃস্ব হয়ে মনুষ্যতর জীবন যাপনের নির্মম বাস্তবতা। জেলে সমাজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, রীতিনীতি, পারিবারিক তথা সামাজিক জীবন, তাদের উৎসব, জীবিকা, আচার-আচরণ, দুঃখকষ্ট, উত্থান-পতন এই উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব ও স্পষ্ট জীবনাবিজ্ঞতার আলোকে চিত্রিত হয়েছে। ‘দলিত জেলে জীবনের আলেখ্য : প্রেক্ষিত হরিশংকর জলদাসের ‘জলপুত্র’ শীর্ষক বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি ‘সাধারণ বর্ণনামূলক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতি’ অবলম্বনে লেখা হয়েছে।

Literary review : হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাসটি নিয়ে ইতিপূর্বে নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে এবং সমালোচনা গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা হয়েছে। সমালোচক সুমনকুমার গাঁতাইত-এর 'হরিশংকর জলদাস : দর্পণে জলজীবন' গ্রন্থে এবং উর্বী মুখোপাধ্যায়ের 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : কাহিনি ও ঘটনার বিন্যাস কৌশল', বীরেন চন্দের 'জল ও জেলে জীবনের নবতম মহাকাব্য', সুশান্ত ঘোষের 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার', সাথী ত্রিপাঠী'র 'হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : সমুদ্র সংগড়ামী জেলেজীবনের কড়চা', মহি মুহাম্মদের 'উপন্যাসে সমুদ্রগামী কৈবর্তজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধেগুলো মূলত 'জলপুত্র' উপন্যাস কেন্দ্রিক। ইতিপূর্বে সমালোচকদের বিবেচনায় 'জলপুত্র' উপন্যাসের নানা বিষয় উঠে আসলেও দলিত জেলে জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসটিকে তেমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি। পূর্ববর্তী সমালোচকদের আলোচনার প্রতি সম্মান রেখে 'জলপুত্র' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে বর্তমান সময়ের নিরিখে দলিত সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বসবাসরত অন্ত্যজ জেলে জনগোষ্ঠীর জীবন সংগ্রাম বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

(১)

'দলিত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'দলন' করা। 'দলন' শব্দের বিশেষণ 'দলিত'। ধর্ম ও বর্ণের নামে এবং অন্যান্য কারণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দলিতরা শোষিত নির্যাতিত মানব-সম্প্রদায়। 'দলিত' বলতে ভারতীয় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার অন্তর্গত কোনো নির্দিষ্ট একটি জাতিকে বোঝায় না, বরং তা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষিত বঞ্চিত সামাজিক গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। দলিতরা সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়া উপেক্ষিত মানুষ।

ভারতে দলিত মুক্তি আন্দোলনের নেপথ্যে মাহার সন্তান ভীমরাও আম্বেদকর-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে জলপান অধিকার সত্যাগ্রহ এবং মনুবাদী, ব্রাহ্মণবাদী সংবিধান 'মনুসংহিতা'র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে দলিত মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলিত মানুষের চিন্তা-ভাবনায় বিপুল পরিবর্তন আসে। চল্লিশ ও পঞ্চাশ-এর দশকে আম্বেদকরের নেতৃত্বে দলিতরা ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে শুরু করে যা পরবর্তীকালে বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক মহলে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়। সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই আম্বেদকর ও তাঁর আন্দোলনকে দলিত সমাজের স্বীকৃতির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মহারাষ্ট্রের বৌদ্ধ সভার উদ্যোগে মাহাড়ের সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন বাবুরাও বাগুল। ভাষণে তিনি দলিতদের নানা দিক নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও দার্শনিক আলোচনা করেন। এই ভাষণকেই অনেকে দলিত আন্দোলনের 'ম্যানিফেস্টো' বলে থাকেন। বিশেষ জনগোষ্ঠী অর্থে 'দলিত' শব্দটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের 'দলিত প্যান্থার' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। নামদেব ধসাল, অর্জুন ডাংলে, জে.ভি. পাওয়ার, দয়া পাওয়ার এই কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক এই আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রাথমিকভাবে এটি সাহিত্যিক আন্দোলন হলেও পাশাপাশি তা একটি রাজনৈতিক আন্দোলনও বটে। আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত আর. পি. আই-এর সঙ্গে 'দলিত প্যান্থার্স' আম্বেদকরপন্থী তরুণদের মঞ্চ হিসেবে চিহ্নিত হয়। আম্বেদকর সমাজের নীচু তলার মানুষের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটি সাহিত্যিক আন্দোলনও বটে। এই 'দলিত সাহিত্য আন্দোলন' মারাঠি ভাষা সাহিত্যের পাশাপাশি গুজরাটি, কন্নড়, তেলুগু, তামিল, হিন্দি ভাষা ও সাহিত্য জগতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং অচিরেই একটি সর্বভারতীয় সাহিত্য আন্দোলনে পরিণত হয়।

(২)

পরম্পরাগতভাবে চলে আসা ললাট লিখনে অন্ত্যজ, দলিত জেলে সম্প্রদায় ভাগ্য নির্ধারিত নিয়মে আবর্তিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। কখনো কখনো তাদের বিদ্রোহী সত্তায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগ যুগান্তরের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। হঠাৎ জেগে উঠেছে চিরকাল ধরে ম্রিয়মাণ থাকা মানুষের অন্তরাত্মা। কিন্তু ইতিহাস তাদের সেই জেগে ওঠাকে মেনে নিতে চায় না। ফলত তাদের জন্য ইতিহাসের পাতায় রচিত হয় না কোনো স্বর্ণ অধ্যায়। মূক, বধির ইতিহাসের সেই বঞ্চিত দলিত

মানুষদের অপঠিত পৃষ্ঠার অলিখিত অন্ধকার অধ্যায়ে আলো জ্বেলেছেন বাংলা সাহিত্যের যে কয়েকজন সাহিত্যিক, হরিশংকর জলদাস (জন্ম-১৯৫৩) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হরিশংকর জলদাস বাংলাদেশের একজন প্রতিভাধর ঔপন্যাসিক। তাঁর 'জলপুত্র' (২০০৮) উপন্যাসটি বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলে জীবনের আলেখ্য হিসেবে পাঠক মহলে সমাদৃত। উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলে পল্লী। এই উপন্যাসের পরতে পরতে রয়েছে সমুদ্রের নোনা জলে মিশে থাকা উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের নিম্নবর্গ, দলিত জেলেদের সুখ-দুঃখ, হাহাকার ও বঞ্চনার ইতিহাস। লেখক হরিশঙ্কর জলদাস জন্মেছেন জেলে পল্লীর এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে, অভাব-অনটন আর দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছেন। বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতায় তিনি জেলে সমাজের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির দিকগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। তাই উপন্যাসে যে সমাজকে তিনি দেখিয়েছেন, সেজন্য তাঁর নিজের জীবনের খেরোখাতাই যথেষ্ট।

(৩)

'জলপুত্র' উপন্যাসের কাহিনি অংশের শুরুতেই এর মূল চরিত্র ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। উপন্যাসটি স্বামীহারা ভুবনেশ্বরী তথা ভুবনের আখ্যানবৃত্ত। ভুবনের সংগ্রামী জীবনই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য বিষয়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ভুবন এগিয়ে গেছে। এক উথাল-পাথাল ঢেউয়ের দিনে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ভুবনের স্বামী চন্দ্রমণি আর ফিরে আসেনি, তার লাশও পাওয়া যায়নি। তাই রীতি অনুযায়ী বারো বছর সধবার বেশে স্বামীর অপেক্ষায় থাকতে হয় তাকে। একমাত্র শিশুপুত্র গঙ্গাপদ আর বৃদ্ধ শ্বশুরকে নিয়ে তার জীবন। কখনো মুখ বুজে মার খাওয়া, কখনো তেড়ে ওঠা, শেষপর্যন্ত অনাগত জলপুত্রের প্রত্যাশায় তার জীবন বহমান থেকেছে উপন্যাস জুড়ে।

> "অনেক ক্লান্তি, অনেক দারিদ্র্যেও, তার চোখের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি। সে চোখে দৃঢ় প্রত্যয়, বেঁচে থাকতে হবে— বাঁচিয়ে রাখতে হবে গঙ্গাপদ ও শ্বশুরকে। স্বামী নিখোঁজ হওয়ার পাঁচ বছর পরেও ভুবন বিধবার বেশ ধরেনি। আজও সে রঙিন শাড়ি পড়ে, শাঁখা পড়ে। মন ভালো থাকলে মাঝে মধ্যে কপালে সিঁদুরের টিপ দেয়। অনেকে পরামর্শ দিয়েছে সধবার বেশ ত্যাগ করে বৈধব্য গ্রহণ করতে। তার এরকম বেশবাস দেখে অনেকে আড়ালে আবডালে নিন্দা-মন্দও করত। কিন্তু ভুবন কোনকিছুকেই আমল দেয় না। তার বিশ্বাস—তার স্বামী চন্দ্রমণি একদিন না একদিন ফিরে আসবেই।"[১]

জীবনের তাগিদে বেঁচে থাকার আশায় অন্নের অন্বেষণে ভুবনকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে। ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভুবন বেরিয়ে আসতে চেয়েছে দলিত জেলে জীবনের অন্ধ কানাগলির যুপকাষ্ঠ থেকে। ভুবনের স্বপ্ন ছিল 'গঙ্গাপদ পড়বে, সমুদ্রে মাছ মারতে যাবে না কখনো'।[২] একটু মাথা উঁচু হলেই বাপের সঙ্গে জেলে সমাজের কিশোরদের মাছ ধরার পেশায় যুক্ত হওয়ার যে রীতি শত সহস্র বছর ধরে প্রচলিত, বিধবা ভুবনেশ্বরী পুত্র গঙ্গাকে সেই রীতিতে বাঁধতে চায়নি। ভুবন চায়নি চন্দ্রমণির মতো গঙ্গাপদও মা গঙ্গার ভোগে যাক। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও জেলে নারী ভুবন মাছ বিয়ারীর জীবিকা গ্রহণ করেছে। পুত্র ও শ্বশুরকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদেই তার এই জীবিকা গ্রহণ। অথচ জেলে পাড়ায় একসময় তাদের পরিবারটি একটি স্বচ্ছল পরিবার ছিল। চন্দ্রমণি যতদিন বেঁচে ছিল জীবিকা সংস্থানের জন্য ভুবনকে বাইরে যেতে হয়নি। চন্দ্রমণির সমুদ্রে নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় সংসারের অভাব অনটন। ভুবন দাঁতে দাঁত কামড়ে জীবনের তাগিদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। সময় তাকে বাধ্য করে কঠিন এই জীবন সংগ্রামে ব্রতী হতে। জীবনের সুখ-আহ্লাদ সব বিসর্জন দিয়ে ভুবন ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামী জীবনের অভিমুখে। বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রামের কঠিন মন্ত্র আয়ত্ত করতে তাকে প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে হয়েছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র গঙ্গাপদ। মা ভুবনেশ্বরীর আশা ছিল 'হিন্দু-মুসলমানের সন্তানদের মতো সেও শিক্ষিত হয়ে বাপের অপমৃত্যুর দাগ ভুবনেশ্বরীর হৃদয় থেকে মুছে দেবে'।[৩] কিন্তু, বাস্তবে তেমনটি ঘটেনি। গঙ্গার পড়াশোনা বেশি এগোয়নি সামাজিক বিবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে। অত্যন্ত অল্প বয়সেই মায়ের কষ্ট দূর করার জন্য পড়াশোনা ছেড়ে মায়ের সঙ্গে মাছ বিক্রিতে যোগ দিয়েছে গঙ্গা। গঙ্গা তার পারিবারিক পেশাতেই যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে।

নিয়তি তাকে সে দিকে নিয়ে গেছে। বড় হতে হতে জেলে জীবনে প্রবেশ করে সে বুঝতে পারে জেলেরা বংশ পরম্পরাগতভাবে কীভাবে মহাজনদের শোষণের শিকার হয়; কীভাবে শশিভূষণ রায় ও আব্দুস শুক্কুর দিনের পর দিন সুদ নিয়ে, স্বল্প দরে মাছ কিনে আর মরসুম শেষে দাদনের টাকার ভুল হিসেব করে জলদাসদের শোষণ করে চলেছে। সে প্রবীণ জেলেদের সামনে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মহাজনী কারবারের চক্রান্ত ফাঁস করেছে। পাশাপাশি মহাজনদের চক্রান্ত থেকে বাঁচবার কৌশলও জেলেদের জানিয়ে দেয়। প্রথম বারের মত মহাজনের সাহায্য ছাড়া জেলেরা জাল পেতেছে দেখে নিজেদের সাম্রাজ্য হারানোর ভয়ে শশিভূষণ রায় ও আব্দুস শুক্কুর জেলেদের জালের আগে জাল পাতার গভীর ষড়যন্ত্র করে। গঙ্গার নেতৃত্বে জেলেরা সমবেত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজালুর রহমান চৌধুরীর কাছে গিয়েও প্রতিকার পায় না। আর তখনই জেলেরা একত্রিত হয়ে লড়াইয়ের সংকল্প করে। শেষপর্যন্ত আব্দুস শুক্কুরের চক্রান্তে গঙ্গার মৃত্যু হয়। গঙ্গার বাবা চন্দ্রমণি সমুদ্র গিয়ে আর ফিরে আসেনি, গঙ্গা ফিরেছে তবে লাশ হয়ে। গঙ্গার লাশ প্রতিবাদের মশাল উড়িয়ে আলো দেখিয়ে গেছে অন্ধকারে নিমজ্জিত উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেদের। উপন্যাসে গঙ্গাপদ প্রতিবাদের প্রতীক। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ানোর আত্মবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায় এই চরিত্রে। সে মহাজনী শাসনের অন্যায় শোষণকে সবার সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। গঙ্গাপদ উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের সকল জেলেদের একত্রিত করে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। অপমানিত জেলেদের সংঘবদ্ধ করে তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছে। সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ ও কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো চারিত্রিক বলিষ্ঠতা এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(8)

'জলপুত্র' উপন্যাসটি দলিত জীবনের বাস্তব দলিল। এই উপন্যাসের পটভূমি সমুদ্রের কাছাকাছি জেলে জীবন। উপন্যাসের প্রতিটি পরিচ্ছেদে লেখক জেলে জীবনের একেবারে গভীরে প্রবেশ করেছেন। এর প্রধান কারণ লেখক নিজে জেলে সমাজের মানুষ। নিজস্ব অভিজ্ঞতায় জীবন সত্যের নিঙড়ানো নির্যাস এই উপন্যাসে শৈল্পিক মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বিষয়ের গভীরতায় উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে প্রান্তিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত বিড়ম্বনা। জেলে পল্লীর অপাঙক্তেয় দলিত মানুষের চাওয়া-পাওয়া ও অপূর্ণতার কথা লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে ধরা পড়েছে জেলেদের অনিশ্চিত ও সংগ্রামী জীবনের ছবি। গহীন সমুদ্রে মাছের সন্ধানে কঠিন যাত্রার পর জেলেদের বাড়ি ফেরার কোনোও নিশ্চয়তা থাকে না। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে স্বস্তির শ্বাস ফেলে জেলে সমাজের প্রতিটি পরিবার। জেলেদের জীবনে শ্রাবণ মাস সুখের মাস। এই মাসে মা গঙ্গা উজাড় করে জেলেদের মাছ দেয়। মা গঙ্গা জেলেদের সকল দেবীর সেরা। সমুদ্রে যাওয়ার আগে গঙ্গা পূজার মধ্য দিয়ে তাদের শুভ কাজের সূচনা হয়। অন্যদিকে দেবী মনসার প্রতি জেলেদের অগাধ সম্ভ্রম। জেলেদের বিশ্বাস দেবী মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সর্পের কোপানল থেকে তারা রেহাই পাবে। তাই শ্রাবণ মাসে জেলেদের ঘরে ঘরে মনসা পূজা হয় এবং প্রতিরাতে মনসার পুথি পাঠ চলে। এই সময় প্রকৃতি উজাড় করে জেলেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করে দেয়। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই কয়মাস সুখে দিন কাটলেও বৎসরের বাকি মাসগুলি কাটে অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়ে। বিশেষ করে ফাল্গুন-বৈশাখ মাস জেলেদের জন্য বড়ই আকালের মাস। এই সময় তারা দৈনন্দিন প্রয়োজনটুকুও মেটাতে সক্ষম হয় না। বড় জেলেদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল তাদের ছাড়া বাকি সব জেলেদের অবস্থা হয় করুণ।

সমাজের একেবারে প্রান্তে অবস্থিত জেলেদের নানা আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দিকগুলি উপন্যাসে বাস্তবসম্মতভাবে অঙ্কিত হয়েছে। নিখুঁত বর্ণনায় উঠে এসেছে গঙ্গা আর মনসা মায়ের পূজা, পুঁথি পাঠের আসরের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী 'নাউট্যাপোয়া'দের কথা। এই সমাজে নিয়ম আছে জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রে নিখোঁজ হলে জেলের স্ত্রী বারো বছর সধবার জীবনযাপন করবে। তারপর সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বৈধব্য জীবন পালন করবে। জেলে সমাজে বিয়ের আগে ছেলেমেয়েকে সমাজের মুরুব্বীদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। একটা আসর বসানো হয় সমাজের সকলকে নিয়ে। সেই আসরের নাম 'পানছল্লার আসর'। বিয়ের সময় কন্যা পক্ষকে নির্দিষ্ট যৌতুক দেওয়ার নিয়মও রয়েছে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 387 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জেলে সমাজে। জেলেদের ছেলে মেয়ে বড় হলে তারা সেই ছেলে মেয়ের বাপ বা মা নামেই পরিচিত হয়, নিজেদের পরিচয় আর থাকে না। জেলে সমাজের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থাও রয়েছে। জাতের ও সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয় সমাজ দশ জন মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রচলন রয়েছে। মনসা পুজোর পাশাপাশি সমাজে গুরুত্ব পায়— গঙ্গাপূজা, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি। চৈত্র সংক্রান্তির দিন ভোর বেলা প্রত্যেক ব্রতী জেলেনি তার সন্তানদের মঙ্গল কামনায় পূর্বমুখী হয়ে ভক্তি ভরে স্তূপীকৃত সংগ্রহে আগুন দেয়। একে বলে 'যাক দেওয়া'। জেলে নারীদের চিরন্তন বিশ্বাস যাকের আগুনের ধোঁয়া সন্তানদের গায়ে লাগলে তাদের সমস্ত বিপদ-আপদ দূর হবে।

উপন্যাসে উত্তর পতেঙ্গা, হালিশহর, কাট্টলী, খেজুরতলি, ভাটিয়ারী, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, মিরসরাইজুড়ে বিশাল কৈবর্ত জনপদের নিজস্ব সংস্কৃতি, যৌনতা, নিষিদ্ধ প্রেম, দাদনখোর মহাজন, সাগরের ঢেউ আর জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই, সাগরে গিয়ে আর ফিরে না আসা, বিশ্বাসঘাতকতা— সবই এসেছে বাস্তবের পটভূমি থেকে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার নিপুণ ব্যবহারের ফলে উপন্যাসে বর্ণিত জেলে জীবনের বাস্তবতা দৃঢ় ভিত্তিভূমি পেয়েছে। হরিশংকর জলদাস নিখুঁতভাবে এই ভাষা তুলে এনেছেন, আর সেই সঙ্গে যোগ করেছেন একেবারে শিক্ষা বিবর্জিত একটি জনপদের সব অশ্রাব্য বুলি। কিন্তু পড়তে গিয়ে মনে হবে, এ গালিগুলো না থাকলে জেলে জীবনটা মেকি হয়ে যেতো। উপন্যাসে প্রতিবাদের ভাষাই যেন প্রকাশ পেয়েছে অশ্রাব্য গালিগালাজ রূপে। আপাত দৃষ্টিতে ভাষার এরূপ ব্যবহারকে অশ্লীল মনে হতে পারে, যদিও উপন্যাসের গভীর অনুধাবনের পর অপাঙক্তেয় দলিত মানুষের মর্মবাণী পাঠক হৃদয়ে গভীর দাগ কেটে যায়।

বছরে বর্ষার তিন-চার মাস আয় হলেও বাকি সময় জলপুত্রদের বেকার হয়েই সংসারের অভাব অনটন বয়ে বেরাতে হয়। মোটামুটি খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার আশাতে তিন-চার মাস আয়ের এই মরশুমে তাদের সংগ্রাম চলে নিরন্তর। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এড়িয়ে জীবনের ঝুঁকি কাঁধে করে তাদের বেরিয়ে যেতে হয় মৎস্য আহরণে। সমুদ্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রতিনিয়ত চলে তাদের জীবন প্রবাহ। প্রকৃতির নিকট কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তাদের টিকে থাকতে হয়।

প্রকৃতির খেয়ালিপনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে জেলেদের জন্মজনিত জাতপাতের বঞ্চনা। জেলে পাড়ার অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, -

> "উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়াটি ভদ্র লোকালয় পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন। ভদ্রপল্লী থেকে প্রায় মাইল দুয়েক দূরে বঙ্গোপসাগরের কোলে পাড়াটি নীরক্ত হয়ে শুয়ে আছে। হিন্দু ও মুসলিম পাড়াটি এই জেলে পাড়া থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করছে।"[৪]

সম্পূর্ণ আলাদা ভৌগোলিক অবস্থানে নিম্নবর্ণের জলদাসদের বসবাসের চিত্রটি তাদের প্রতি হওয়া উচ্চবর্ণের কালান্তরের বঞ্চনার ইতিহাসকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে। অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন যাপনের বাস্তবতা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করে তোলে—

> "জেলেপাড়ার জীবন গাবের রসে চুবানো। এখানে প্রাণ আছে প্রাণবান পরিবেশ নেই। জীবন আছে, জীবনায়নের সুস্থির বাতাবরণ নেই।"[৫]

এই জেলে সমাজের মানুষ পদদলিত হয়েছে মুসলমান এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা। কমলমুন্সির হাটে এক মুসলমান ক্রেতা মাছ কিনতে এসে ভুবনকে ছাতার বাট দিয়ে আঘাত করে। ভুবনের ছেলে গঙ্গা তখন লোকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বাজার ভর্তি লোক দুই দলে বিভক্ত হয়। একদল নিম্নশ্রেণি থেকে উঠে আসা জলদাসদের পক্ষ নিলেও অন্যদল গঙ্গার বর্ণ ও জাতিগত পরিচয়কে লক্ষ্য করে বলে—

> "ডোম অলর লগে মুসলমানর কিঅর তুলনা, ডোম ডোম। ডোম অইয়েনে মুসলমানর গাআত হাত। ওই চোদানির পোয়ারে পিসি ফেল।"[৬]

অন্যদিকে জোনাপ আলীর বাপের কাছে বংশীর মা ইলিশ মাছ বিক্রি করতে না চাইলে জনইপ্যার বাপ জোর করে মাছ নিয়ে যেতে চাইলে বংশী প্রতিবাদ করে। প্রতিক্রিয়ায় জনইপ্যার বাপ বলে, -

> "কী কইলি চোদানির পোয়া, আঁর জাগার উয়াদ্দি মাছ ধরতি যাস্ ডোমর পোয়া, আর আঁরে মাছ নো দিবি?"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 387 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই গালি যেন দলিত জেলেদের ভাগ্যলিপি।

বাস্তবের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে লেখক এই উপন্যাসে সামাজিক শোষণ ও লাঞ্ছনার শিল্পসার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জয়ন্তর সঙ্গে গঙ্গাপদ বিয়ে বাড়িতে বৈরাগী ঢুইল্যার বাদন দলে বাজনা বাজাতে গেলে সকলের খাওয়া শেষে বাজনাদারদের খেতে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অথিতিদের নানা লোভনীয় খাবার পরিবেশন করা হলেও উঠোনের এককোণে বসিয়ে বাজনাদারদের কলাপাতায় দেওয়া হয় একেবারেই যৎসামান্য খাবার। বিয়ে বাড়িতে বাজনাদারদের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক হলেও সমাজে এরা অস্পৃশ্য এবং বর্ণবাদের নিরিখে এরা দলিত, নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠী। এমনকি গৃহকর্তা সদাশিব ভট্টাচার্য চেঁচিয়ে বললেন—

> "অ প্রদীপ, ঢুইল্যা অলেরে কও, খাওনর পরে আঁইডা আর কলাপাতা যেঅন খালপাড়ত পেলাই দি আইয়্যে। হিতারার আঁইড্যা কেউ ছুঁইতো নো।"[৮]

সদাশিব ভট্টাচার্যের এই সব কথা এবং খাওয়ার নিয়ে এই বর্ণবাদী আচরণে গঙ্গাপদ বিস্মিত হলেও বৈরাগী, জয়ন্ত নির্বিকার থাকে। প্রচলিত এই সামাজিক বর্ণ বৈষম্যে বৈরাগী, জয়ন্তের মতো জেলেরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই সদাশিবের এই আচরণ তাদের কাছে বিশেষ দোষের বলে মনে হয়নি।

অন্যদিকে ভুবনেশ্বরীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ছেলে গঙ্গাপদ স্কুলে যাওয়া শুরু করলেও সেখানে সবাই তার জাত তুলে অপমান করে। গঙ্গার পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়ার নেপথ্যে এও ছিল একটা কারণ। স্কুলের অধিকাংশ হিন্দু ছাত্ররাই গঙ্গার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেনি। জেলে বলে দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> "দুষ্টু ছেলেরা জাইল্যা, ডোম বলে ঘৃণামিশ্রিত ইয়ার্কি করে তার সঙ্গে। তাদের নিষ্ঠুর আচরণ গঙ্গাকে বিপন্ন করে। ...এই তিরস্কার ও ঘৃণা পেয়ে গঙ্গা পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উঠে এসেছে। সহপাঠীরা ধীরে ধীরে বড় হয়েছে, লাঞ্ছনার মাত্রাও বেড়ে গেছে সেই অনুপাতে।"[৯]

তথাকথিত দলিত জেলে জীবনের নানা অনুষঙ্গ, ঘাত-প্রতিঘাত, সংগ্রামী জীবনের আলেখ্য হিসেবে উপন্যাসটি পাঠকের মনোগহণে ব্যতিক্রমী শৈল্পিক অনুভবে ধরা দেয়। উপন্যাসের আখ্যানে প্রতিফলিত হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে উদভ্রান্ত জেলেদের যুগের পর যুগ নিঃস্ব হয়ে মনুষ্যতর জীবন যাপনের নির্মম বাস্তবতা। উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে পাঠকের পরিচিতি ঘটে দলিত জলপুত্রদের বিচিত্র জীবন সংগ্রামের সঙ্গে।

জেলেদের জীবনে একদিকে রয়েছে প্রকৃতির বিরূপতা অন্যদিকে আছে দাদনদারদের ক্রমাগত শোষণ। বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামের পর সামাজিক শোষণ-বঞ্চনার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি এই অবহেলিত জনপদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। ভাগ্যলিপিকে অনিবার্য মেনেই তারা জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের সমাজ-সভ্যতায় বেঁচে রয়েছে। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-ভিত্তিক সামাজিক শোষণ প্রক্রিয়ায় কতটুকু পরিবর্তন এসেছে, একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাস সেই প্রশ্নকেই আবার জাগ্রত করে পাঠক মনে। জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য, উচ্চবর্ণের শোষণ ও হিংস্রতা আইনের চোখে বদলে গেলেও সমাজের চোখে তার পুরোপুরি বদল ঘটেনি। দরিদ্র, বঞ্চিত, দলিত মানুষদের জন্য আত্ম-নিবেদনের এমন সংহত চেতনা নির্মাণের প্রশ্নে ও নিম্নবর্গের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ও সমস্যার কথা যথাযথরূপে উপস্থাপনের পরিপ্রক্ষিতে 'জলপুত্র' উপন্যাসটি শিল্পসার্থক হয়ে উঠেছে।

Reference:

১. জলদাস হরিশংকর, জলপুত্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-২০০৮, পৃ. ২৩
২. ঐ, পৃ. ১২
৩. ঐ, পৃ. ১৩
৪. ঐ, পৃ. ১৩
৫. ঐ, পৃ. ১৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 46
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 387 - 393
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. ঐ, পৃ. ৯৫
৭. ঐ, পৃ. ৫৫
৮. ঐ, পৃ. ৬৯
৯. ঐ, পৃ. ৩১

Bibliography:

গাঁতাইত সুকুমার, হরিশংকর জলদাস : দর্পনে জলজীবন, একতারা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশ কাল ২০২২
ঘোষ সুশান্ত, হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র : আঞ্চলিকতার বর্ণময় বিস্তার, IJHSS, Vol-VI, Issue-I, ২০১৭
চক্রবর্তী প্রাপ্তি (সম্পাদনা), একুশ শতকের বাংলা উপন্যাস, দিয়া পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ২০২১
প্রামাণিক মৃন্ময় (সম্পাদক), দলিত সাহিত্য চর্চা, গাঙচিল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০২২
বিশ্বাস মনোহরমৌলি, দলিত সাহিত্যের রূপরেখা, বাণীশিল্প, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭
মুহাম্মদ মহি, হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, অবসর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০১৭